Spread Love, not Virus

গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

বিভিন্ন ঘটনাচক্রে পৃথিবীর চেহারাটা বদলে যাচ্ছে। ভারত-চীন সম্পর্ক সুপ্রাচীন এবং বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ। অথচ ভারত আজও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু চীন ভীতি প্রদর্শন এবং আক্রমণের মাধ্যমে হতে চায় এশিয়া মহাদেশের তথা বিশ্বের সর্বময় কর্তা। ঠিক কতটা মুনাফা হল করোনার ভাইরাস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে? এর উত্তর সাম্রাজ্যবাদী চীনের কাছে নেই, কারণ ঐ দেশের বুদ্ধিভ্রষ্ট নেতারা আজ দুর্দম বেগে ছুটে চলেছে ধ্বংসের পথে...

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ৪
সেপ্টেম্বর ২০২০

কলম হাতে

অভিজিৎ চৌধুরী, দীপঙ্কর সরকার, প্রদীপ কুণ্ডু, অমিত কুমার সাহা, নাহার আলম, ডাঃ অমিত চৌধুরী, সরজিৎ মণ্ডল, স্বাগতা পাঠক, সামিমা খাতুন, প্রণব কুমার বসু এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

প্রতিটা মানুষের জন্যই প্রকৃত সফলতার চাবিকাঠি হলেন একজন সুযোগ্য গুরু বা শিক্ষক। যাঁর আশিস পরশে একজন শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসী ও অগ্রগামী। শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকা যে কেউ হতে পারেন। অর্থাৎ আমাদের চড়াই-উৎরাই পথে তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি আমাদের সঠিক পথের দিশা দেখান প্রতিনিয়ত, প্রতিমুহূর্তে। শিক্ষক-শিক্ষিকা মানেই যে শুধু তিনি পড়ুয়াদের পড়াশুনা শেখাবেন তা কিন্তু নয়। তিনি হতে পারেন একজন পরামর্শদাতা, কিংবা বিফল মানুষকে সফলতার সিঁড়ি খুঁজে দেওয়ার দূরদর্শীসম্পন্ন, সুবিবেচক পথপ্রদর্শক ও শুভানুধ্যায়ী।

ভারতবর্ষে সেই সকল পথপ্রদর্শক তথা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে ৫ই সেপ্টেম্বর পালিত হয় শিক্ষকদিবস। উক্ত দিনটি শিক্ষাবিদ এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণএর জন্মদিবস। তিনি রাস্ট্রপতি পদে ভূষিত হওয়ার পর, তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র ও বন্ধুরা তাঁর জন্মদিবস পালনে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। তখন তিনি জানান, "Instead of celebrating my birthday separately, it would be a privilege if 5th September is observed as Teachers' Day" সেই থেকে প্রতিবছর, এই দিনটি সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শিক্ষকদিবস হিসাবে পালিত হয়। ■

বিনীতা –

রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন



জন্ম ০৫ ০৯ ১৮৮৮ । মৃত্যু ১৭ ০৪ ১৯৭৫
When we think we know, we cease to learn."
"Teachers should be the best minds in the country."
"True teachers are those who help us think for ourselves."
"The end-product of education should be a free creative man, who can battle against historical circumstances and adversities of nature."
Dr. Sarvepalli Radhakrishnan
শিক্ষক দিবসে, আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, মর্যাদিত দার্শনিক এবং মহান শিক্ষক মহাশয় ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কে জানাই অগণিত প্রণাম...

কলম হাতে

কলম হাতে



প্রচ্ছদ চিত্রঃ
গৌতম বোস



প্রচ্ছদ মডেলঃ
চন্দ্রিমা বোস দত্ত





শিক্ষক দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রদীপ কুন্ডু

শিক্ষক হলেন পিতার সমান
তিনিই ধর্মগুরু,
বাবা মায়ের থেকেই মোদের
শিক্ষা-জগৎ শুরু।

শিক্ষক পথে চলতে শেখান
দেখান নতুন জগৎ,
মায়ের স্নেহ ভালোবাসায় সে যে
সবার চেয়ে মহৎ।

শিক্ষক মোদের বন্ধু হয়ে
শোনেন মনের কথা,
সঠিক পথের দিশারী হয়ে
জোড়ান মনের ব্যথা।

শিক্ষক মোদের সফলতায়
আনন্দে ওঠেন মেতে,
ভালোবাসার পুষ্প সদা
তাঁর হৃদয়ে ফোটে।

শিক্ষক দিবস

শিক্ষক দিবসে জানাই তাই
সকল শিক্ষককে সম্মান,
জীবনে যেন চিরদিন আমি
রাখতে পারি তাঁদের মান। ■

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

দ্বিতীয় পর্যায় (৩)

আজ শুক্রবার, ২৬/২/১৬ — খুব ভোরেই মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। অনেকটা উঁচু দিয়ে হাঁটছি আমরা। দুই পাশে অনন্ত খাদ, পিচ ঢালা চওড়া রাস্তা দিয়ে দু'চাকা থেকে ছ'চাকা যানগুলো দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। জলভরা মেঘ সমস্ত শরীরে শীতল স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। ছুটে একটি মন্দিরে আশ্রয় নিলাম।

পাশের বাড়ির থেকে এক মাতাজী এসে মন্দিরের দরজা খুলে বসতে দিলেন এবং চা খেতে অনুরোধ করলেন। চায়ের খুব দরকার ছিল। বৃষ্টিতে ভিজে শীতে কাঁপছিলাম। আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর বৃষ্টি ভেজা রাস্তা দিয়ে এলাম বর্গী গ্রামে। ভিজে কাপড়ে থাকার জন্য শীত কিছুতেই কমছে না, তাই আবার একটা চায়ের দোকানে কিছুক্ষনের জন্য আশ্রয় নেবার পরে আবার রাস্তায় নেমে এলাম। রাস্তায় কাজ হচ্ছে তাই চলার গতি মন্থর। আসতে আসতে সূর্যদেব দর্শন দিচ্ছেন, এবং আশ্চর্যের বিষয় সূর্য ওঠার সাথে সাথেই পুরো আবহাওয়া বদলে গেল। আমরা এগিয়ে চলেছি, দুই পাশে ঘন জঙ্গল, মাঝে রাস্তা। হঠাৎ

দেখি একটা দামি গাড়ী থেকে একবৃদ্ধা নেমে আমাদের একশো টাকা দিয়ে প্রণাম করলেন, এটা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর এবং আপত্তিজনক কিন্তু এখানকার রীতি এই। আমরা জঙ্গলের মধ্যে একটা গাছের তলায় বসলাম।

বাংলায় এই সময় সমস্ত গাছ ফল, ফুল, পাতায় ভরে থাকে; কিন্তু এখানে দেখছি কেমন রুক্ষ শুষ্ক। মন খারাপ করা পরিবেশ। দুপুর বারোটায় চলতি পথে একটি শিবমন্দিরে কিছুক্ষন আশ্রয় নিলাম। মন্দিরের মহারাজ আমাদের দেখে খুবই বিরক্ত হলেন, একটু জল চাওয়াতে বললেন, “ইধার কুছ নেহি মিলেগা।” কি আর করি? কিছুক্ষন পর আবার চলতে শুরু করলাম।

খিদে, জলপিপাসা দুটোই এখন আমাদের সাথি প্রায় দেড়ঘণ্টা চলার পর রাস্তার পাশের একটি ধাবা থেকে একজন লোক সবিনয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে এসে দাঁড়াল। আমরা গেলাম এবং মধ্যাহ্নভোজন প্রসাদ পেলাম। লোকটি কোন পয়সা নিতে চাইল না। জোর করে তাকে কিছু টাকা দিলাম। মা নর্মদার কাছে এই লোকটি এবং সাধুটির সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আবার রাস্তায় নেমে এলাম। কিছুটা চলার পরে যে গ্রামটি পেলাম নাম এখন মনে নেই, ওখান থেকে জব্বলপুর তেরো কিলোমিটার, কিন্তু আমাদের চলার রাস্তা ওটা নয়। এই রাস্তায় গেলে নর্মদা খণ্ডন হবে তাই দিব্যানন্দজী আমাদের নিয়ে বাম দিকের পথ ধরলেন। পথকে যদি প্রশ্ন করা যায় পথ তুমি কার

উত্তর আসবে পথিকের। আমরা পথকে সাথি করে কোথা থেকে কোথায় হেঁটে চলেছি। আমাদের লক্ষ্য বৃত্তের মত নর্মদা নদীকে প্রদক্ষিন করে আবার শুরুর জায়গায় অর্থাৎ অমরকণ্টকে ফিরে যাওয়া। তারপর ওঙ্কারেশ্বরের মাথায় জলরূপী নর্মদাকে সমর্পণ করার পর পরিক্রমার সমাপ্তি, এটাই সাধনা বা তপস্যা। তপস্যা অর্থাৎ তাপ সয়া, অনেক বড় কথা।

পথচলতি এক সাধুর কাছে শুনেছিলাম কেউ কষ্ট করতে মায়ের কাছে আসে না, আসে মায়ের স্নেহ আদর পেতে। যুগ যুগ ধরে মাতৃ হৃদয় স্নেহের ফল্গুধারা নিয়ে অবিচলিত হয়ে আছে শুধু কাছে যাওয়ার অপেক্ষা। সাধু আরও বললেন একবার নর্মদা পরিক্রমা করতে পারলেই মায়ের কোল বাঁধা আর কোন সাধনারই দরকার হয় না। কথাগুলো আমার খুব ভাল লাগলো। সত্যিই তো, মায়ের কাছে আবদার করবো, কষ্ট করার জন্য মায়ের কাছে যাব কেন? পরিক্রমার নিয়ম মেনে মাকে চোখে চোখে রেখে এগিয়ে গেলে মায়ের দর্শন আর স্নেহ পাওয়া যাবে।

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।"

নানখের গ্রাম পেড়িয়ে বিকেল পাঁচটার সময় আমরা একটি আশ্রমে এসে পৌছালাম, কিন্তু সেখানে থাকার জায়গা

নেই। কিছু পরিক্রমাকারী ফিরে যাচ্ছেন তাই আমরাও ফেরার পথ ধরলাম। আর তিন কিলোমিটার যাওয়ার পরে লণ্ঠেটা ঘাটে এসে পৌছালাম।

এক মহারাজ আমাদের একটি শনি মন্দিরে থাকতে দিলেন, কিন্তু একটি ছেলে আমাদের পাশের একটি আশ্রমে কাশি মহারাজের কাছে নিয়ে গেল মহারাজের বয়স প্রায় একশো বছর। আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। সকালে পুণ্যসলিলা কলনাদিনী নর্মদাতে স্নান করলাম। ঘাটটির নাম শনিকুণ্ড। শনিদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন, এবং ঋষি পিপ্পলাদ এখানে শিব তপস্যা করে পিপ্পলাদেশ্বর শিবের দর্শন পেয়েছিলেন। এখানে এক পরিক্রমাবাসী সাধুঋষি পিপ্পলাদের যে জন্ম বৃতান্তটি শোনালেন, সেটি শুধু অবৈজ্ঞানিকই নয় অবাস্তব এবং হাস্যসকর। তাই একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে ঐ গল্পটির উল্লেখ না করে সবাইকে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চললাম।

নর্মদে হর। ■

ঘৃণার ইমন

নাহার আলম (বাংলাদেশ)

যেবার আমি গিয়েছিলাম
কাজলকোঠাবিলে, মাথায় নিয়ে রোদ গলা দুপুর!
চেতনখোলা হাট পেরিয়ে আরও কিছুটা দূর...
পলাশ শিমুলেরা তখন ফুটেছিলো একা।
কৃষ্ণচূড়ার ডগায় ছিলো লালের রেখা।
ঝরঝরে কিছু মেঘবতী ছায়া দেখে ময়ূরেরা
সবেতে মেলেছিলো পাখা।

দূর থেকে দেখা যায়,
ছোট্ট এক ডিঙি নৌকায়,
ঘোমটাপরা কাদের বউ,
বাপের বাড়ি নাইওর যায়।

সেদিনও কলম ছুঁইনি আমি কাগজের পাতায়। এরও কতকাল
আগে থেকে তেমন কিছুই লিখিনি আর!
বাজপড়া মন, তাতানো সারাক্ষণ!
আসে না মগজে শব্দ তেমন! ফোটে না কবিতার ফুল।
কী এক বিষাক্ত ঘৃণায় তিন তালাক দিলাম
কবিতারে আমি তখন,
ভীত হই ভেবে পরক্ষণেই,

অন্তরা

করিনি তো কোনো ভুল !
আহ্নিক বেদনার পলিরা শুধু পাশবালিশের
ওপর মাথা রেখে আলস্যে ঘুমোয় এখন।
নিশি জাগা আহ্লাদী চাঁদ, দখলে নেয় আমার সকল কান্নারে
তারই সাথে — এক্কেবারে একা হই যখন!
একটাই আঁচল দেখি আঁধারের মতো মাথার ওপরে পাতা,
তারই ছায়াতলে, ক্রমাগত বেড়ে চলে পঙ্গুত্বের ব্যথা!

আমিও তখন জোছনার সাক্ষাৎ-উল্লাসে ছুটে যাই আঙিনায়
বাধা পাই। দেখি চেয়ে-
ঘুঙুর নয়, শেকল পরা আমার দুটি পা'য়!
শুনতে পাই, স্বৈরী বাতাসে ভাসে ব্যক্তিগত
ঘৃণার ইমন কলতান!
গৃহত্যাগ মন, ইচ্ছাময়ী হয়ে তারই সাথে গায়,
বেলা শেষের গান... ■

লক ডাউন

অভিজিৎ চৌধুরী

এক মুখ কাঁচা পাকা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আকাশ পাতাল চিন্তা করছিলো নিতাই। চিন্তা একটাই, পৃথিবী থেকে কবে দূর হবে এই দুরারোগ্য ব্যাধি। সারা বিশ্ব জুড়ে শুধু হাহাকার আর হাহাকার। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ অসুখে পড়ছে আর মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে। এতো ডাক্তার এতো বৈজ্ঞানিক সবাই ফেল, এমন অসুখ যার না আছে ওষুধ না আছে ইনজেকশন। এখন একমাত্র ভরসা শুধু ভগবান। অফিস, দপ্তর, কলকারখানা, স্কুল-কলেজে বাজার, দোকান পাট সব বন্ধ। বেশির ভাগ মানুষেরই রোজগারের রাস্তা হয়েছে বন্ধ। দেশে কাজ নেই, খাদ্য নেই, যা চাল ডাল পাওয়া যাচ্ছে সব আকাল কেড়ে দাম। মাছ মাংস তো গত দু আড়াই মাস হলো নিতাই চোখেই দেখে নি।

নেহাত পৈতৃক ভিটেটা ছিল, তাই মাথার ওপর ছাদটা আছে। আর কিছু শাক সবজিও বিনা পয়সায় পেয়ে যাচ্ছে। না হলে কি যে করতো নিতাই, ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। রোজই খবরে শুনছে মানুষের পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, ঘরে খিদে আর বাইরে জীবাণু।

আবেগ

বাস্তু জমি অনেকটা, তা প্রায় কাঠা সাতেক তো হবেই। তবে ঘর মোটে ওই চারটে, প্লাস্টার ছাড়া দেওয়াল আর মাটির মেঝে ওপরে টালির চাল। এদিকে দুটো ঘর এক চিলতে বারান্দা ও রান্নার জায়গা, এদিকটায় নিতাই তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকে। উঠোনে নামলে বাঁ দিকে আরো দুটো ঘর আছে, তাতে নিতাইয়ের অবিবাহিত দাদা থাকেন। বিয়ে থা করেননি, ওই ঠাকুর দেবতা ও পুজো পাঠ নিয়েই থাকেন। তবে গাছপালা লাগানোর শখটা ওনারই আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জামরুল, কুল বাতাবি লেবু ছাড়া নারকোল সুপুরি এমন কি একটা খেজুর গাছও আছে বাড়িতে, আর ছিল নানান জাতের ফুলের গাছ ও শাক সবজি। আর বেড়ার ধারে আছে গোয়াল ঘর, সেখানে আছে গোটা ছয়েক ছাগল-খাসি ও দুটো পাটনাই গরু।

নিতাইয়ের ছিল বাজারে একটা চায়ের দোকান। তা রুজি-রোজগার বলতে এই দোকানই সম্বল। তা আয়ে মোটামুটি ভালোই হতো, তাই পাঁচ জনের সংসারও চলে যাচ্ছিলো। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হতো না। সকালে চায়ের সঙ্গে সিঙাড়া মুড়ি, ডিম সেদ্ধ, রুটি তরকারি আর বিকেলবেলা চপ মুড়ি, কোনো কোনো দিন ডাল পুরি ছিল মেনমেনু, তাই বেচা-কেনাও ভালোই চলছিল। তার মধ্যে এই বিপদ, মানে শুরু হলো লক ডাউন। নিতাই ভেবে পাচ্ছিল না এখন সে কি করবে? মাসে যা উপার্জন হচ্ছিল

তা গেল, রোজগারের রাস্তা বন্ধ, এবার পেট চলবে কি করে! দুশ্চিন্তা ছাড়া করার আর কিছুই নেই। সন্ধ্যা হচ্ছে, না কি ভোর! কিছুই মনে টনে থাকছে না আজকাল। দু'চোখে অসহায়তা ও মুখে ক্লান্তির ছাপ দেখে নিতাইয়ের বৌ দুর্গা বলল, "হ্যাঁ গো, কি এতো চিন্তা কর সারাদিন? নাও তো চা খাও" বলে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলো মেঝেতে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে উদাস ভাবে নিতাই বলে, "ভাবছি এই ভাবে চললে তো আমাদের মতো মানুষকে না খেতে পেয়ে মরতে হবে গো।" দুর্গা খুবই ধার্মিক প্রকৃতির মহিলা তাই বলল, "তুমি আমি আর ভেবে কি করবো বলো, জীব দিয়েছেন যিনি আহারও দেবেন তিনি। অত চিন্তা করে করে শরীর খারাপ করে কোনো লাভ আছে কি!"

"সে তো সবই বুঝি গো রবির মা, কিন্তু পকেট যে একদম খালি হয়ে গেল। এদিকে যা দু'পয়সা জমানো ছিল, সে তো লকডাউনের প্রথম দু'মাসেই শেষ। আর যখন বাজার খুলবে তখন দোকান চালু করতেও তো টাকা লাগবে, সে টাকা আসবে কোথা থেকে তুমিই বলো?"

"সব ঠিক হয়ে যাবে, এতদিন যখন কাটলো ঠাকুরের আশীর্বাদে তখন আরো কিছুদিনও নিশ্চয় কেটে যাবে তাঁর দয়ায়" বলে কপালে হাত ছোঁয়াল দুর্গা।

"তোমার আঁচলের গিঁটে হয়তো কিছু আছে, কিন্তু তা দিয়ে আর কদিন চলবে বলো? আর ছেলে-মেয়ের সঞ্চয়,

তাও ধার নিয়ে নিয়েছি চড়া সুদে, বুঝেছো...” বলে ম্লান হাসলো নিতাই। “শোনো যদি তুমি মত দাও তো একটা কথা বলি” একটু ইতস্তত হয়ে নিতাই স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বলল।

“কি বলবে বলই না.....তবে দেবার মতো আমার কাছে এই চারগাছা চুড়ি ছাড়া কিন্তু আর কিছুই নেই।” সামান্য উদাস হয়ে বলে দুর্গা।

“আরে না না আমি তোমার চুড়ি চাইছি না, মানে বলছিলাম যদি তুমি বোলো তাহলে....” বলতে পারে না নিতাই। “আঃ অত আমতা আমতা করছো কেন বলতো? যা বলবে বলই না।” বলে স্বামীর হাতে হাত রাখে দুর্গা। “বলছিলাম....রহিমকে ডেকে একবার তোমার ওই বুধো আর ভুরাকে কি দেখাবো?” অনেক কষ্টে বলে চোখ নামিয়ে নেয় নিতাই।

“রহিম....মানে ওই মাংসওয়ালা কসাই!” চমকে উঠে বলে দুর্গা, “দুটো পয়সার জন্য তুমি ওদের কসাইয়ের হাতে তুলে দেবে!” এক অজানা বেদনায় দুর্গার চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল পড়তে থাকে। সে বলে, “না না ও আমি পারবো না, তুমি অন্য কিছু ভাবো।”

“আহা তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন? ঠান্ডা মাথায় একবার চিন্তা করো, এতো বড়ো বড়ো খাসী, তোমার কি কাজে লাগবে? এরপর তো ওদের গা থেকে ভোঁটকা গন্ধ ছাড়বে

কেও কিনতেও চাইবে না।” হাত কচলাতে কচলাতে অনুরোধ করে নিতাই স্ত্রীকে।

“না না ও আমি পারবো না....না খেয়ে মরবো তাও ভালো।” বলে দুমদাম করে পা ফেলে দুর্গা চলে যায় ঘরের ভিতরে, নিতাইও পিছন পিছন এগিয়ে যায়। “শোনো শোনো কান্নাকাটি করে কি লাভ? আমার কথাটা শোনো তো, গিয়ে দেখলো দুর্গা তক্তপোষে উপুড় হয়ে শুয়ে গুমরে গুমরে কেঁদে চলেছে। অবশেষে নিতাই আবার বাইরে এসে দাওয়ায় বসে। পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে, সে উদাস ভাবে তাকিয়ে থাকে সামনে নেমে আসা অন্ধকারের দিকে। অপরাধীর মতো বসে থাকা লোকটার মনের জ্বালা বুঝলো না কেউই। রাতে রুটি খেতে খেতে কথাটা আবার পারলো নিতাই, নিজের কথা শেষ করে সে অসহায়ের মতো সবার দিকে তাকিয়ে রইলো উত্তরের অপেক্ষায়...

সব শুনে বড়ো ছেলে রবি বলল, “হুম একথা তো ঠিকই আর কত দিন শুধু শুধু পুষবে ওদের!” “এরপর তো ওদের গায়ে ভোঁটকা গন্ধ হয়ে যাবে...” যোগ করে দেয় ছোট ছেলে তপাও। কিন্তু সেজোছেলে চুপ করে থাকে, এমনিতেই ও একটু কম কথা বলে। “তাই বলে কসাইকে দিতে হবে? অন্য কাউকে দাও না বাবা,” মেয়ে ঝুমা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে কথাগুলো।

আবেগ

"কসাই ছাড়া কে কিনবে অত বড়ো খাসী? আর তুই যে চিবিয়ে চিবিয়ে মাংস খাস... সেই খাসীগুলো বুঝি আকাশ থেকে পড়ে?" মুখ ভেংচে বলে রবি।

"ওকি তুমি আবার খাবার ছেড়ে উঠে পড়লে কেন?" একটু বিরক্ত হয়েই নিতাই বৌকে জিজ্ঞাসা করে। "আমার খিদে নেই।" ধরা গলায় বলে উঠে যায় দুর্গা।

"কোথাও কিছু নেই এখন থেকেই নেওয়া খাওয়া ছেড়ে বসে পড়লে অমনি, আগে রহিম আসুক দেখুক, ঠিকঠাক পয়সা যদি দেয়... তখন না হয় সবাই মিলে একটা কিছু ভাবা যাবে!" নিতাইয়েরও খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল ঘটি নিয়ে উঠোনে হাত ধুতে নেমে যায়। কথা মতো সকাল বেলা রহিম এলো খাসী দুটো দেখতে। রবি খাসী দুটো এনে কুলগাছে বেঁধে দিলো দড়িটা। রহিম অনেক্ষন ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো খাসী দুটো, তারপর হাতে করে তুলে ওজন দেখার পর বলল, "বলো নেতাইদা কত নেবে?"

"তুমিই বলো না, সবই তো দেখলে। আর তাছাড়া আমরা তো আর খাসীর ব্যবসা করি না... নেহাত মজবুরিতে পড়েছি তাই, নাহলে..."

"তবু তোমার জিনিস দাদা, দামটা তো তোমাকেই বলতে হবে।" বলে পান খাওয়া দাঁত বার করে মেকি হাসি হাসতে লাগলো রহিম। "দুটো খাসীই তুমি নেবে তো? তাহলে ওই পনেরো হাজার দিও" বলে রবি।

আবেগ

"ইয়াহ আল্লাহ! ভাইপো দেখছি বিরাট ব্যাবসাদার হয়েছে নিতাইদা, তোমাকে পনেরো দিলে, আমি কি পাবো বলতো ভাইপো?" বলে একটু ম্লান মুখে তাকায় সবার দিকে।

"কেন! যে কদিন তোমার দোকান খোলা ছিল আমি তো দেখলাম তুমি আটশো টাকা কিলো মাংস বেচছো। তিরিশ-বত্রিশ কিলোর বেশি মাংস তুমি পাবে।" হিসাব বোঝাতে চেষ্টা করে রবি।

যাই হোক অনেকক্ষন দরাদরির পর দশ হাজার টাকা দাওয়ায় রেখে নিতাইকে রাজি করে নেয় রহিম। টাকাটা দিয়ে কুলগাছ থেকে দড়ি খুলে নিয়ে নিতাইকে সালাম করে বেরোতে গিয়ে রহিম দেখল, খাসী দুটো উঠোনেতে চার পা ফাঁক করে গ্যাঁট মেরে দাঁড়িয়ে করুন সুরে ব্যা ব্যা... করে চেঁচাচ্ছে আর ওদিকে মা মেয়ে ঘরের ভিতরে সমানে কেঁদে যাচ্ছে। অনেক ধাক্কাধাক্কি দিয়ে দড়ি ধরে টানাটানি করেও কিছুতেই নড়াতে পারলো না রহিম খাসী দুটোকে। কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল খাসীদুটো নিতাইয়ের দিকে, সেই ভয়ার্ত দৃষ্টি দেখে নিতাইয়ের বিবেক কুঁকড়ে যায়। নিতাই ভেবে পায় না, নিজেদের বাঁচানোর জন্য কি অপরাধে এই অবলা জীব দুটোকে মৃত্যু দন্ড দেবে!

"নিতাইদা আমি বাড়ি থেকে ছেলেদের নিয়ে আসছি, ও ব্যাটাদের তুলে নিয়ে যেতে হবে।" বুঝলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে রহিম। তারপর দড়িগাছা রবির হাতে দিয়ে পা বাড়ালো

যাবার জন্য... "দাঁড়াও রহিম, ও তুমি তোমার টাকা ফিরিয়ে নাও আর কাউকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে না। আ...আমি পারবো না, ওদের ওভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে..." হাত জোর করে ছলছল চোখে তাকায় নিতাই। থতোমতো খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রহিম বলে, "ও কথা বলো না নিতাইদা, আমি না হয় আরো পাঁচশো টাকা তোমায় দিচ্ছি।

"না না, রহিম তুমি আমায় মাপ করো। ওরা যেমন আছে থাক, দিন তো কেটেই যাচ্ছে ওদের মৃত্যু দিয়ে আমি জীবন চাই না। ওরে ঝুমা ও রবির মা... কই গো এস ঘরে নিয়ে যাও তোমাদের বুধো আর ভুরাকে।" স্বজল চোখে তাকিয়ে থাকে নিতাই খাসীদুটোর দিকে, ধীর পায়ে রহিম বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। মনটা অনেক হালকা লাগে নিতাইয়ের, বুকের মধ্যে জমে থাকা ভারটাও যেন কেমন মিলিয়ে যাচ্ছে আসতে আসতে, মাঁচা থেকে হুকটা পেরে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে --রবির মা আজ একটু তামাক সেজে দাও তো। ■



শিকড় (গাঁ গেরামের গপ্পো)

দাদুর বাংলাদেশে আগমন

(২য় পর্ব)

দীপঙ্কর সরকার (বাংলাদেশ)

দিনদিন আমার সঙ্গে পিনুদাদুর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকল। মেসেঞ্জারে রোজ একবার কথা হয়। বিস্তর আলোচনা হয় পৃথিবীর পরিবর্তন নিয়ে; সেই আলোচনায় স্থান পায় চিঠি বিলুপ্তির গল্প; গ্রামীণ ঐতিহ্য ভুলে মানুষের শিকড়হীন হবার গল্প; শহুরে সেজে মুখোশ পরে থাকার গল্প।

এত বছর গ্রাম ছাড়লেও, ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করলেই বোঝা যায় যে তিনি নিজের শিকড় ভুলে যাননি। সময় পেলেই তাঁর বাবার মুখ থেকে শোনা গ্রামীণ গল্প আমায় শোনান। গল্পগুলো তিনি তাঁর বাবার মুখে এতবার শুনেছেন যে সেই ছোটবেলাতে দেখলেও জায়গাগুলোর নাম ও বিবরণ তাঁর নখদর্পণে। যেন চোখ বুজলে তিনি জায়গাগুলো অনায়াসে দেখতে পান। আমি ফেসবুকে গ্রামের ছবি আপলোড করলে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়তেন। পিনুদাদুকে প্রতিদিনই বলতাম একবার বাংলাদেশ থেকে ঘুরে যাও। তিনি বারবার বলতেন, “ওদেশে আমার কোন

আত্মীয় নেই কার কাছে যাব।” “আমি তো আছি; আমার কাছে আসবে,” উত্তর দিতাম আমি।

একদিন মেসেঞ্জারে বললেন, “ভিসা করতে দিয়েছি হাতে পেলে একবার ওদেশ থেকে ঘুরে আসবো।” ভিসার জন্য কম ধকল পোহাতে হয়নি দাদুকে।

দাদুর মুখেই শুনুন তাহলে, “মানুষ যে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার মাতৃভূমির প্রতি একটা টান থাকবেই। ইউরোপিয়ান দেশগুলি আমাদের উপমহাদেশের থেকে অনেক বেশি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। তবু সে দেশে কিছুদিন বসবাসের পর মন ছটফট করতে থাকে প্রিয় মাতৃভূমির জন্য। আর যারা ছিন্নমূল হয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে গিয়ে বাসা বেঁধেছে তাদের? সেই প্রজন্ম কিংবা তারপরের প্রজন্মের? পরভূমিতে আশ্রয় নিলেও মাতৃভূমি তো সেটাই যার জন্য মনের কোণে এক বিশাল পিছুটান রয়ে যায়। কোনটা আমার দেশ এমন দোলাচল আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কারো কারো একটা সম্পূর্ণ জীবন কেটে যায়। আমাদের পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও স্বস্তি নিয়ে না বাবা মরতে পেরেছেন; না আমি মরতে পারব। কোথাও না কোথাও এখনও নিজেকে শরণার্থী বলেই মনে হয়; কোন জাতীয়তাবোধ তৈরি হয়নি। মনের একদিক বলে যে দেশ আমাকে খাওয়ায়, পরায় সেই দেশটি আমার; অপরদিকটি বলে যে দেশে আমার জন্ম হয়েছে সেই দেশটিই আমার।

উৎস

জীবনটা মুদ্রার দুটো পিঠের এপিঠও নয় ওপিঠও নয়; উদ্বাস্তু পরিচয়ে একটা জীবন কেটে গেল ভাবতেই চোখ জলে ভরে যায়। একটা দেশ ক'বার স্বাধীন হবে; ক'বার মানুষ শরণার্থী অ্যাখ্যা পাবে সে সব প্রশ্ন এখন খুব ভাবায়। কতবার এই অঞ্চলটা তার মানচিত্র বদল করেছে। গৌর, পুণ্ড্রবর্ধন, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ। কিছুদিন পরপরই মানচিত্র বদল করে। কিন্তু এই মানচিত্র বদলে অনেককে নিজের সর্বস্ব হারাতে হয়েছে এমনকি নিজের পরিচয়টুকুও। এই যেমন আমার বাবা। কি অদ্ভুত! একটি লোকের জন্মসূত্রে পরিচয় হলো সে ভারতীয়। কিছুদিন পর তার পরিচয় হলো পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তু। যুদ্ধ করে সেখানে মাটি কামড়ে আদায় করে নিল নিজ অধিকার। তার উত্তরপুরুষ পরিচয় বহন করল সে ভারতীয়। আর সেই ছিন্নমূল গর্ব করে বলতে লাগলো, 'আদি বাড়ি পূর্ব পাকিস্তানের অমুক জেলায়।' মধ্যে মাত্র ২৭টা বছর। এবার সে জোড় গলায় বলতে লাগলো আদিবাড়ি বাংলাদেশে। হায়রে! এক জনমে তিনটি দেশের নাগরিক।

জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে মনে হয় মানুষের পিছুটান খুব কাজ করে। আজকাল বাংলাদেশে স্বপ্নে যাই অহরহ। কিন্তু আরও একবার সত্যি সত্যি বাংলাদেশে যেতে পারবো স্বপ্নেও ভাবিনি। আসলে দৈনন্দিন কাজের ব্যস্ততায় ভাবার মতো সুযোগ পাইনি।

উৎস

কালের পরিক্রমায় বিজ্ঞান আরও উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। ভার্চুয়ালজগৎ বলে একটি নতুন জগতের সূচনা ঘটেছে। আর সবার মতো আমিও সেখানে বিচরণ করতে করতে একদিন পেয়ে গেলাম একটি ফেসবুক গ্রুপে কিছু গ্রামের ছবি। বাবার মুখে শোনা গল্পগুলো কেমন যেন বাস্তবের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। ইতোমধ্যে কর্মজীবন ছুটি দিয়ে দিয়েছে। পায়ের তলায় সর্ষে, আর পায় কে? ঘরে বসেই অনলাইনে পাসপোর্টের দরখাস্ত করে ফেললাম। তিনদিনের মাথায় অফিসে ডাক পড়ল। অফিস থেকে বেড়োতে বেড়োতেই মোবাইল স্ক্রীনে মেসেজ এলো 'লোকাল থানায় যোগাযোগ করুন। আপনার ভেরিফিকেশনের পেপার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।' আমাকে আর থানায় যেতে হয়নি। পরের দিন থানা থেকেই অফিসার আমার বাড়িতে এলেন। সব ঠিক ঠিক আছে শুধু একটি তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। মাথায় হাত! কি ভুল? না আমি পাসপোর্টে যে বাড়ির ঠিকানা দিয়েছি, আমার আধার কার্ডে, ভোটার কার্ডে, ড্রাইভিং লাইসেন্সে যে ঠিকানা আছে তার সাথে কর্পোরেশনের ট্যাক্সের বিলে দেওয়া বাড়ির ঠিকানা মিলছে না। কি যে মুস্কিলে পড়া গেল! অফিসারকে গাঁদা থেকে দামী গোলাপ ফুলের কত রকম পুজোই যে দিতে উদ্যত্ত হলাম কিছুতেই কিছু হলো না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে

প্রাচীন তথ্য খুঁজে দেখা গেল বাড়ির ঠিকানা ঠিক আছে কিন্তু কম্পুটারাইজড করার সময় সিরিয়াল নম্বরটি বাড়ির নম্বর হিসাবে লেখা হয়ে যাওয়াতেই গন্ডগোল। বললাম 'ঠিক করে দিন।' অধিকর্তা জানালেন, 'ঠিকানা পরিবর্তনের দরখাস্ত করতে হবে।' বললাম, 'ভুল যখন আপনারা করেছেন ঠিকটাও আপনারা করুন, আমি তো ভুলটা দেখিয়ে দিয়েছি।' তারপরের ঘটনা শুনে আর কাজ নেই। অতিকষ্টে ঠিকানা ঠিক হলো। অবশেষে ভিসা হাতে পেলাম। নিজের দেশে যাব তবুও নিজের দেশের ভিসা ছুঁয়ে একবার চুমু খেলাম; চুমুকে বাংলার গন্ধ পেলাম।"

ভিসা হাতে পাওয়ার পর পিনুদাদু আমাকে মেসেঞ্জারে কল করলেন। ফোন রিসিভ করতেই পিনুদাদুর গলা, হ্যালো, "কেমন আছো দীপুদা?"

— ভালো আছি। তুমি?

— ভালো, আজ ভিসা হাতে পেলাম।

— বাঃ দারুণ খবর। অবশেষে আসতে পারছো তা হলে...

— যেতে তো আমাকে হবেই। বাংলার জল আর রূপ না দেখে মরেও যে শান্তি পেতাম না। জানো, আজ ভিসা হাতে পেয়ে কি করেছি? একটা চুমু খেয়েছি। বাংলার ঘ্রাণটা অনুভব করেছি। নিজের দেশে যেতেও ভিসা লাগছে কি অবাক করা কাণ্ড বলো দেখি!

— তা তো বটেই। তা কবে আসবে বলে ঠিক করলে?

— এখনো ঠিক করিনি। তুমি যখন বলবে তখন।
— দিন-তিনেক অপেক্ষা করো। বুধবার এলে শুধু বৃহস্পতিবার আমার ক্লাস মিস হবে শুক্র শনি তো সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে ফলে ক্লাস নষ্ট হবে না।
— তাই হবে। আগামী বুধবার যাচ্ছি। তোমার ফোন নাম্বারটা ইনবক্সে দিয়ে রাখো আমি রাজশাহী স্টেশনে নেমে কারো ফোন থেকে কল করে নেবো।
— আচ্ছা, দিচ্ছি।

বুধবার যেন আসতেই চাইছে না। এতো কাল অপেক্ষা করেছিলেন কিন্তু আর তিনটা দিন যেন যেতেই চাইছে না। কত রকম প্ল্যান করছেন শুধুমাত্র নিজের দেশটা দেখবেন বলে। অবশেষে অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো। বুধবার ভোরের ট্রেনে চড়ে পিনুদাদু সীমান্ত পার হলেন। বহুবার ভারতীয় সীমান্ত থেকে বাংলাদেশকে দেখেছেন কিন্তু প্রতিবারই ভীষণ রাগ হতো। ওই কাঁটতারের বিভাজন তার পুরানো ক্ষতে ঘি ঢেলে দিতো। কিন্তু এবার সীমান্ত পার হতেই এক ধরণের ভালো লাগা কাজ করলো। দাদু দারুণভাবে উচ্ছ্বসিত। আহা! কত কাল যেন এরকম সৌন্দর্য দেখেননি। চোখের গভীরে এতো তৃষ্ণা লুকিয়ে ছিল তা কোনদিন বুঝতেও পারেননি। গেদে বর্ডার হয়ে দর্শনাতে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেন সরাসরি রাজশাহীতে পৌঁছবে। ট্রেন এগিয়ে চলছে রাজশাহীর দিকে। ট্রেনের জানালা থেকে

উৎস

বাইরে প্রকৃতি দেখা যাচ্ছে। কী অপরূপ সেই দৃশ্য! যতোটা চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে তার চেয়েও বেশি মন ভরে যাচ্ছে। বেলা একটার সময় আমার ক্লাসের তখন শেষ পিরিয়ড চলছে। এমন সময় একটা অচেনা নাম্বার থেকে ফোন এল। ক্লাস থেকে বের হয়ে ফোন রিসিভ করলাম। ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে এল – "দীপুদা স্টেশনে পৌঁছেছি। একলোকের ফোন থেকে কল করছি। এবার কোথায় যাব বলো?"

— স্টেশনে একটু অপেক্ষা করো; আমি ক্লাস শেষ করে তোমাকে নিতে আসছি।

— আচ্ছা।

ক্লাস শেষ হতে আর পাঁচ মিনিট বাকী। ক্লাস শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইনগেট থেকে একটা অটো নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম। মনে অনেক জল্পনাকল্পনা খেলা করছে। কোন ভার্চুয়াল মানুষকে প্রথমবার সামনাসামনি দেখা; মানুষটি বাস্তবে কেমন হবে যেতে যেতে এসব ভাবছিলাম। মিনিট পনেরো পর স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। স্টেশনে বসার জায়গায় একটা লাগেজ নিয়ে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। প্রথম দেখা, দুজনের দুজনকে চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না। সঙ্গে সঙ্গে বুকে জড়িয়ে নিলেন। মনে হলো অনেকদিন পর তিনি যেন হারানো আত্মীয়কে ফিরে পেলেন। ফেসবুক

প্রোফাইলে যেমন ছবিটি দেখেছি, মানুষটি তার চেয়েও সুন্দর; ভিডিওকলে বা অডিওকলে যা কথা হয় মানুষটি তার চেয়েও অমায়িক। সবচেয়ে ভালো লাগে মানুষটির রসবোধ। তারপর অটোতে উঠে আমার হোস্টেলের দিকে রওনা দিলাম। হোস্টেলে নামতেই বললেন, দীপুদা একটা ডিটারজেন্ট দিবে?

— কেন?

— তোমাদের দেশের টাকাগুলো এতো নোংরা ইচ্ছে করছে ওগুলো যদি ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুতে পারতাম!

হাসতে হাসতে দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। হোস্টেলের ছয়তলায় আমার ঘর। কোন লিফট নেই। সিঙ্গেল রুমে থাকি। একজনের কোনরকমে হয়ে যায়। টেবিল আর বই ছড়ানো ছেটানো চারদিকে। পুরো ছয়তলায় লাগেজটি নিজেই টেনে উঠলেন; আমি অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমায় দিলেন না। তারুণ্য তার চেহারায় খেলা করে; লাগেজ তুলতে তুলতে বলছিলেন, "বুঝলে দীপুদা এখনো বুড়ো হইনি; বুড়ো ব্যাপারটা পুরোটাই মানসিক নাতবউ না দেখেও মরবো না এই বলে দিলুম।" রুমে লাগেজ রেখে ফ্রেশ হতে গেলেন পিনুদাদু। ...ক্রমশ ■

শরতের ছোঁয়া

সামিমা খাতুন

কালো মেঘ ভেসে চলে যায়,
রেখে যায় বর্ষার রেশ।
সাদা মেঘ পাহাড় সাজায়,
পট নীলাকাশের দেশ।

ভোরের বেলা হিমেল হাওয়ায়,
মাথা দোলায় কাশের বন।
হিয়ার মাঝে কাঁপন ধরায়,
ঢাকের বাদ্যির অনুরণন।

খুশির আমেজে গাঁথা মালা,
বাতাসে পুজোর গন্ধ।
মনে লাগে উৎসবের দোলা,
অনুভবে আগমনীর ছন্দ।

প্রকৃতি সাজে মনের মতো,
করতে দেবীর আবাহন।
পূজার ভাবনায় শিহরিত,
আজকের এই শুভ ক্ষণ। ■

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ



মুল্যঃ ৮০ টাকা [অনলাইনে কুরিওর শুল্ক অতিরিক্ত]

অ্যামাজন লিঙ্কঃ

https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

এখন কলেজ স্ট্রীটেও পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিকানাঃ আদি নাথ ব্রাদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা – ৭০০০৭৩ ● দূরভাষঃ +৯১ ৩৩ ২২৪১ ৯১৮৩

আজ মহালয়া

শুভ্র নাগ

পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের শুরু। কিন্তু এ বছরে সে নিয়ম ভেঙে চুরমার। বিশবিশে এও এক বিস্ময়। সৌরবর্ষ আর চান্দ্রবর্ষের খেলা – অতিমারী – আম্ফান – একই মাসে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ – পিতৃপক্ষের পরে এ এক নামহীন পক্ষ – এ বছর আরও কত কি দেখাবে কে জানে!

কিন্তু প্রকৃতি তো তাঁর আবাহনের সব ডালা সাজিয়ে রেখেছেনঃ নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা – মাঠে মাঠে সাদা কাশের ঢেউ – জলে প্রস্ফুটিত পদ্ম – ভোরে শিউলি ঝরছে টুপ-টাপ – কৈলাসে অস্থিরতা – মহাদেবের অনুমতি পাবার পরেও পিত্রালয়ে আসার উপায় নেই উমার – এদিকে উদাত্ত কন্ঠে আবাহন করছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ – রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি। হৃদমাঝারে দেবী – কিন্তু আমার পর্ণকুটিরে কই?

আজ ডুব দিই সেই পুরোনো দিনগুলোয় – মহালয়ার আগের রাতে রেডিওর পরীক্ষা রাতজাগা পাখীর ডাক – সারা বছর ভোরে ওঠার অনীহা থাকলেও এদিনে ঘুম ভাঙবেই ব্রাহ্মমুহূর্তের আগে – শুরু থেকে শুনতে হবে যে

নিবন্ধ

– হাল্কা ঠান্ডার পরিবেশ – বিছানায় মশারির ভেতর বাবার কাছে শুয়ে তাঁর গায়ের ওম নিতে নিতে “মহিষাসুরমর্দিনী" শোনা। স্নান সেরে মা ঠাকুরের পরিচর্যায় ব্যস্ত – পায়ে আলতা – লালপাড় শাড়ী – কপালে লাল টুকটুকে টিপে মা তখন চিণ্ময়ী উমা – পুজোর গন্ধ আর মায়ের গন্ধ মিলেমিশে একাকার। পিতৃপক্ষ শেষে আমার দেবীপক্ষ শুরু। সকাল হলে গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে যাত্রা – ওখানেই বাবা তর্পণ করছেন সূর্যকে সাক্ষী রেখে।

কালের নিয়মে সেই বাবা হারিয়ে গেলেন – মায়ের পায়ে আলতা নেই – কপালে আর জ্বলজ্বল করে না টিপ – তবু সেই শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা মাতৃমূর্তি আর দেবীমূর্তি কিভাবে যেন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠত এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত।

আজ তাঁরা দুজনেই পিতৃলোকে, আমার পূর্বপুরুষদের সাথে। সম্বৎসর শেষে একটু জল পাবার প্রত্যাশায় আজ তাঁরা আসছেন। আমার গোটা জীবনটা যাঁরা সাজিয়ে দিয়েছেন আজ তাঁদের সেই প্রত্যাশা পূরণের মাহেন্দ্রক্ষণ। সামান্য তিল-তুলসী-গঙ্গাজল। কি অল্পতেই সন্তুষ্ট এনারা। অনামিকায় কুশের আংটি আর – "বিষ্ণুরোঁ অমুক গোত্রঃ পিতা অমুক দেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা।"

নিবন্ধ

##

আজ আমার আনন্দের দিন। আজ পঁচানব্বই বছরের এক তরুণের কাছে নতজানু হয়ে বসব অস্তাচলগামী সূর্যের সামনে – আমার মত অনেকেই তাঁর সামনে স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় নিজে হাতে জ্বালিয়ে দেবে প্রাণের প্রদীপ – উদাত্ত কণ্ঠে আমরা একসাথে বলব:



"তোমারি আঙনে বসেছিনু মোরা,
পেয়েছি তোমাতে শিক্ষা -
হেথা গুরুপদে প্রণতি জানায়ে,
লভেছি জীবনে দীক্ষা।
জ্ঞানের দুয়ার দিয়েছ খুলিয়া
মোদের জীবন প্রভাতে
সেই জ্ঞানেতে গরীয়ান মোরা,
এসেছি প্রণাম জানাতে।"

আজ যে মহালয়ার পুণ্যদিনে অপরাহ্নের পুণ্যলগ্নে জন্ম নেবে আমার... থুড়ি আমাদের স্বপ্নের 'ইস্কুলবেলা'* – 'সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইন্সটিটিউশন' মানে আমার স্কুলের প্রাক্তনীদের পত্রিকা – আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকব আমি।

রেডিওতে স্তোত্রপাঠ শেষ - ভোরের আলো ফুটছে - পাঁজি বলুক না বলুক আমার দেবীপক্ষ কিন্তু শুরু হয়ে গেল। ■

* ইস্কুলবেলা: https://www.sknireunion.com

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ



রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

URL: https://www.boichoi.com/RohosyerCharOdhyay

কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...

ধারাবাহিক গল্প

শেষ রাতের মরীচিকা

স্বাগতা পাঠক

(২)

তবে কি সে রাস্তা ভুল করে অন্য গলিতে ঢুকলো! এইসব ভাবতে ভাবতে তার নিজের খুব বিরক্ত লাগছিল। কে জানে রনি কতক্ষন দাঁড়িয়ে আছে! আরও এখনও গিয়ে পৌছাতে পারল না। এবার অগত্যা সে পকেট থেকে ফোনটা বের করতে গেল, হঠাৎ তার চোখে পড়ল, একটু দূরে একটা ঝুপির মত দোকানে মিটমিটে আলো জ্বলছে। একটু এগিয়ে আসতেই দোকানের ছোট্ট ল্যাম্পের আলোয় সব্যসাচী রনির মুখটা ঠাহর করতে পারল। আরে ওই তো বিশু কাকার দোকান, একটু অবাক হল সব্যসাচী। আচ্ছা দোকানটা তো এই গলির মুখে থাকার কথা, তবে কি সে ভুল করছে এই বৃষ্টি ও রাতের অন্ধকারে গুলিয়ে ফেলছে নাতো? এই সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে সে এগিয়ে চলল। দোকানটার সামনে যেতেই প্যাচ করে ডান পা'টা প্রায় হাফ হাত কাদায় গেঁথে গেল।

সব্যসাচী অস্ফুটে বলে উঠলো, "ইস এত কাদা তো বিশু কাকার দোকানের সামনে নেই। আবার পরক্ষণেই তার মনে হলো, বলা যায় না... যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাতে কোনো

কিছু অসম্ভব না। কোনো মতে কাদা বাঁচিয়ে, সে গিয়ে ঢুকল দোকানে। “বিশু কাকা, কি গো দোকানের সামনে কি গর্ত খুঁড়েছো নাকি! কাদাতে তো আমি ডুবেই যাচ্ছিলাম।” সব্যসাচী একটু মজা করেই বললো কথাটা।

বিশু কাকা হেসে বললো, “না গো দাদা বাবু, আগের দিন এইখানে একটা গাড়ি এক্সিডেন্ট হয়ে রাস্তাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে।”

— সে কি গো এক্সিডেন্ট?

— হ্যাঁ দাদা বাবু।

রনি এবার বেস বিরক্তি নিয়ে বলল, “কি আক্কেল রে তোর, আমি কতক্ষন ধরে এসেছি জানিস?”

— আরে ভাই তুই আমাকে মেসেজ করেছিলিস। তোকে ঘুরিয়ে আমি ফোন করলাম তোর ফোন অফ আসছে... কি করি বল?

“আরে আমার ফোনটার চার্জ শেষ হয়ে গিয়েছে।” রনি বলল।

“এই দুর্যোগ, তার মধ্যে একটা অটো নেই, রিক্সা নেই, এতটা পথ, রাস্তার মধ্যে এক হাঁটু জল হেঁটে আসতে তো সময় লাগবেই ভাই।” সব্যসাচী একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে উত্তর দিলো। “আমার কথা ভাব, আমার বাড়িটাও তো অনেকটা দূর। আমি তো আসলাম। আজ তো আবার বাইকও আনিনি।” রনি একটু প্রতিবাদী সুরেই বললো।

"যাক এত রাগ দেখাস না। তবুও তো আমি আসলাম। আর অমিত সে ব্যাটাকে তো ফোনেই পাচ্ছি না।" সব্যসাচী সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বলল। রনি মুখে শুধু একটু শব্দ করল, হুম ...

এবার সব্যসাচী বিশু কাকাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আরে কাকা বৃষ্টিতে ভিজে আমি পুরো কাক স্নান হয়ে গেছি আমাকে একটু চা দাও আগে।" বিশু কাকা বলল, "এই তো জল চাপিয়েছি। রনি দাদা তো এর মধ্যেই ৩ কাপ খেয়ে ফেলেছে আবার বলল চা বসাতে। এই কাপ খেয়েই চলে যেত আপনি যদি না আসতেন।"

"আচ্ছা! রনি তারপর বল কি খবর?" একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে বললো সব্যসাচী। অনেকক্ষন থেকেই সে লক্ষ্য করছিল রনির মুখটা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে। জিজ্ঞেস করলো, "ভাই কি হয়েছে আপসেট নাকি?" রনি বলল, "না রে ভাই, মনটা ভালো নেই।"

সব্যসাচী রনির পিঠ চাপড়ে বলল, "কেন রে তোর মনের আবার কি হল?"

"অদিতির কথা মনে পড়ছে খুব।" রনি একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে বলল। "তুই আবার অদিতির সাথে ঝগড়া করেছিস নাকি?" সব্যসাচী একটু ধমকের সুরেই জিজ্ঞেস করলো।

অদিতি, রনির প্রেমিকা। সেই স্কুল জীবন থেকেই ওদের প্রেম। বাড়ির থেকে মেনে নিচ্ছে না বলেই ওদের বিয়েটা পেন্ডিং। অদিতির বাড়ি থেকে মেনে নিলেও রনির বাড়ি থেকে মানছে না। অদিতি

আলী... হ্যাঁ এটাই হল মুস্কিল। অদিতি মুসলিম। হিন্দুমায়ের গর্ভজাত মুসলিম বাবার মেয়ে অদিতি। অদিতির মা ছিলেন তৎকালীন সময়ের প্রভাবশালী এক ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে, অনুরাধা মুখার্জী। কলেজে পড়ার সময় কলেজের একজন বাংলা অধ্যাপক ইউসুফ আলীর প্রেমে পড়েন। তিনি জানতেন, বাড়ি থেকে এই সম্পর্ক কোনো দিন মেনে নেবে না। তাই তিনি অদিতির বাবা – মানে ইউসুফ আলীর সাথে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করেন। তারপর থেকে তিনি আর তাঁর বাড়ির কারোর সাথে দেখা করতে পারেননি জীবনে কোনদিন। যোগাযোগ করতে চাইলও, অদিতির মামারা সেটা হতে দেননি। তার দাদুও ছিলেন বেশ বদরাগী। এমনকি যখন অদিতির দিদা মারা যান, তখনও তার মাকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেওয়া হয়নি, তখন অদিতি খুব ছোট্ট ছিল। তবে আদিতির বাবা একজন খুব শিক্ষিত আর ভদ্র মানুষ। কোনোদিন নিজের ধর্মের কোনো আচার নিয়মকানুন অনুরাধা দেবীর উপর চাপিয়ে দেয়নি। এমন কি অদিতি হিন্দু এবং মুসলিম দুটি ধর্মের নিয়ম আচার অনুষ্ঠান পালন করে এবং সেটা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই।

রনির সাথে একই স্কুলে পড়ত অদিতি, তখন থেকেই ওদের বাড়িতে আসা যাওয়া ছিল ওর। কাকিমা মানে রনজয় সেনের মা অদিতিকে ভালবাসতেন এবং স্নেহ করতেন। কিন্তু যবে থেকে তিনি জেনেছেন যে ছেলের সাথে অদিতির সম্পর্ক আছে, তবে থেকে অদিতির সাথে তাঁরও সম্পর্কে ছেদ এসেছে। একজন মুসলিম মেয়ে, ছেলের

ভালো বন্ধু হওয়াতে তাঁদের আপত্তি নেই, কিন্তু তাকে বাড়ির বউ করা যায় না। সেটা রনিকে তার পরিবার মানে মা আর বাবা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। রনি ওর মা বাবার একমাত্র ছেলে তাই মা বাবার কথা অমান্য করতে সেও পারে না। আবার অদিতিকে ছাড়া সে থাকতেও পারে না। সেই কোন ছোট্টবেলার প্রেম ওদের।

অদিতি আর রনি দুইজনেই মার্কেটিং লাইনের স্টুডেন্ট। অদিতি এখন আমেরিকাতে সেটল হয়েছে। ভালো কোম্পানিতে জব করে। বাইরে যাওয়ার চান্স রনিও পেয়েছিল, কিন্তু মা রনিকে ছাড়া থাকতে পারবেন না, তাই মায়ের কান্নাকাটির কবলে পড়ে রনির আর যাওয়া হল না। তবে রনি এখানে ওয়েল সেটেলড্। রনি বাড়িতে জানিয়ে দিয়েছে, সে বাড়ির অমতে অদিতিকে বিয়ে করবে না ঠিকই, কিন্তু তা বলে সে অন্য কোনো মেয়েকেও বিয়ে করবে না। এই নিয়ে ওর বাড়িতে মাঝে মাঝেই একটু অশান্তি হয়, সেটা সব্যসাচীর জানা। অদিতির সাথে সব্যসাচীর আলাপ আছে, বেশ মিষ্টি মেয়ে। প্রতিবার পুজোতে সে বাড়িতে আসে আর পুজোর দিনগুলো রনির সাথে তার কাটে। আর বাকি সারা বছর লং ডিসটেন্স রিলেশনশিপএর উপর ভরসা করেই বেঁচে থাকা।

অদিতিরও বেশ বয়েস হয়েছে, হিসাব মত সে রনির বয়েসী ওরা এক ক্লাসের স্টুডেন্ট ছিল। এখন অদিতির

বাড়ির থেকেও বিয়ের জন্য চাপ আসছে। কারণ বয়েস ত্রিশ পেরিয়ে যাওয়া একটি মেয়ের পক্ষে, ফিউচারে অনেক জটিলতা আসে লেট ম্যারেজএর কারণে। এতো কিছুর পরও অদিতি কিন্তু রনির মুখ চেয়ে বসে আছে। সব্যসাচীও অনেকবার কাকিমাকে মানে রনির মাকে বুঝিয়েছে। তাঁকে অনেক হুজ্জুতি করে বোঝানো গেলেও, ওর বাবার সামনে কথা বলার সাহস সব্যসাচীর তো দুরের কথা – স্বয়ং রনিরও নেই। মাঝে মাঝে রনি নিজের মনের কষ্টগুলো ধরে রাখতে না পেরে সব্যসাচীর কাছে বলে একটু হালকা হয়।

পঞ্চম রাউন্ডের চাটা দিল বিশু কাকু হাত বাড়িয়ে। আজ আর বিশু কাকু বিরক্ত হচ্ছে না। অন্য দিন মোটামুটি ৩ বার চা করে বলে, "বাপু আর কত খাবে? এবার থামো।" আজ হয়তো কোনো খদ্দের নেই বলেই বিশুকাকু কোনো রা কাটছে না মুখে। চায়ে চুমুক দিয়ে সব্যসাচী রনির কাঁধে হাত রেখে বলল, "ভাই চিন্তা করিস না। এত বছর অপেক্ষায় যখন কাকিমার মন একটু হলেও গলেছে, দেখিস কাকুও রাজি হয়ে যাবে।"

আসলে আজ রনির মুখে যা শুনলো সব্যসাচী তার সারমর্ম এই যে, আজ কাকুর সাথে – অর্থাৎ রনি তার বাবা আদিনাথ সেনের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেড়িয়েছে। আদিনাথ সেন কোলকাতার নামজাদা

একজন উকিল। সবাই ওনাকে খুব মান্য করে চলেন। খুব সম্মানীয় ব্যাক্তিত্ব, রনিও ওনাকে যমের মত ভয় পায়। তবে আজ নাকি ভয়ানক রকমের ঝামেলা হয়েছে বাড়িতে।

এই দিকেই অদিতির বাড়িতেও বিয়ের জন্য চাপ আসছে। অন্য দিকে রনির বাড়ির লোক রাজি হচ্ছে না। কদিন ধরে ওর মুড পুরো ঘেঁটে ছিল। আজ এই সব কথায় কথা ওঠে আর বাবার সাথে ঝগড়া লাগে। দুপুরের খাওয়ার টেবিল থেকে অর্ধেক ভাত খেয়ে উঠে পড়ে রনি। তারপর এখনও পর্যন্তই বাড়ি ফেরেনি সে।

সব্যসাচী রনিকে কিছু একটা বলতে যাবে এমন সময় হঠাৎ সব্যসাচীর ফোনটা বেজে উঠল। পকেট থেকে সেটা বের করতে করতে কেটে গেল, হাতে নিয়ে দেখল অমিতের মিস্‌ড কল। রনি জিজ্ঞেস করলো, “কে ফোন করেছে?”

সব্যসাচী বলল, “অমিত, আমি সন্ধ্যে বেলায় ওকেও কয়েকবার ফোন, করেছিলাম তখন ওর ফোনটা নট রিচেব্‌ল আসছিল। এখন হয়তো মিস্ড কল এলার্ট দেখে আমাকে কল ব্যাক করল। কিন্তু কেটে গেল কেন? আসলে ওয়েদারের যা অবস্থা, তাতে নেটওয়ার্ক থাকাটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।

রনি ব্যস্ত হয়ে বলল, “থাক না! বাড়ি গিয়ে পরে কল করে নিবি। কথা বলতে বলতে সব্যসাচী অমিতের কলটা ডায়েল করে ফেলেছে। কিন্তু না সেই একই কথা নট

রিচেব্‌ল। ফোনটা বন্ধ করে আবার পকেটে রাখার সময়, চোখ পড়ল সময়ের দিকে – রাত তখন ১১টা ৪০।

সব্যসাচী সময়টা দেখে লাফিয়ে উঠে বলল, "সর্বনাশ এত দেখি বারোটা বাজতে গেলো!! এত রাত হয়েছে খেয়ালই করিনি। আর বিশুকাকা তুমি তো অন্য দিন দশটার মধ্যে দোকান বন্ধ করো, আর আজ চা দিয়েই যাচ্ছ, কই একবারও তো বললে না! আজ কোনো কাস্টমার নেই বলে, আমাদের কাছ থেকে আজকের দিনের পুঁজিটা পুষিয়ে নিচ্ছ বুঝি?"

বিশু কাকু একটু হেসে উত্তর দিলো, "তা বলতে পারো.. সব্যসাচী দাদাবাবু। রনি তখনও মন মরা হয়ে বসে আছে।

সব্যসাচী রনির পাশে বসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "ভাই, দেখ যা হয়েছে ভুলে যা। এখন বাড়ি ফিরে যা। কখন বেরিয়েছিস আর এখনও বাড়ি যাসনি তার উপর তোর ফোনটাও অফ। কাকিমা চিন্তা করবেন। আবার সেই অসুস্থ না হয়ে পড়েন! এই দুর্যোগের রাতে আর বাইরে থাকিস না। আমাকেও তো বাড়িতে ফিরতে হবে, কাল আবার অফিস আছে। জানিস তো প্রাইভেটের চাকরি, যেমন মাইনে দেয় ঠিক তেমন কথাও শোনায়।"

রনি এবার চায়ের কাপটা রেখে পকেটে হাত দিয়ে পার্সটা বের করছিল। সব্যসাচী বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়া আমি দিচ্ছি।"

...ক্রমশ ■

শারদীয়

প্রণব কুমার বসু

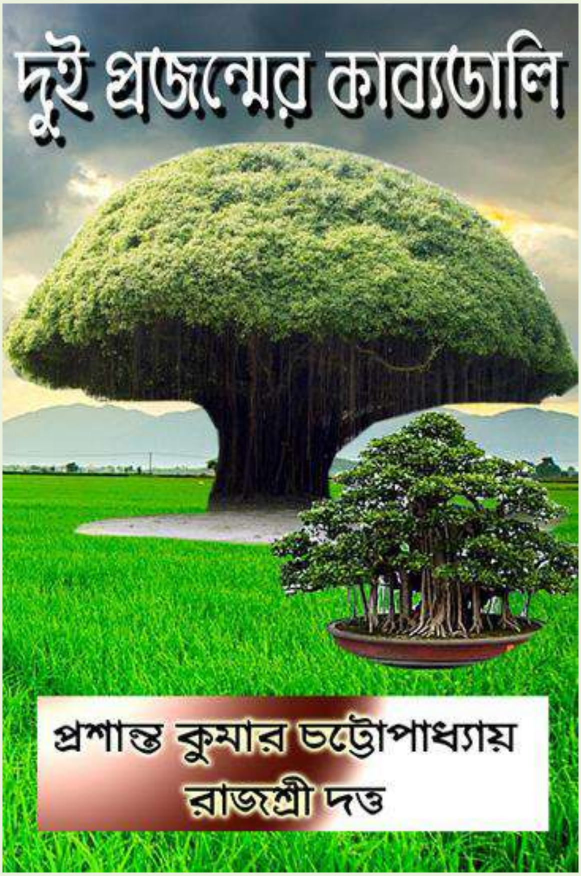
দুর্গাপুজো
আসছে আসছে
জানিয়ে দিলো মহালয়া
পুজোয় চাই অনেক শাড়ি।
হলে ভালো হয় নতুন গাড়ি
বোনাসের টাকা দু'দিন বাদে হয়েছে শেষ ।

সেজেগুজে সবাই মিলে ঘুরতে লাগে বেশ
প্যান্ডেল হপিং সেরে ফেরা বাড়ি।
শুয়ে পড়লাম বেশ তাড়াতাড়ি
সিনেমা যাব আলোছায়া
কাটলেট ভাজছে
পেটপুজো। ■

'গুঞ্জন'এর লেখা সম্পর্কে আপনাদের মুল্যবান মতামত পাঠিয়ে দিন। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সম-আলোচনা, সেরা পাঠক হিসাবে বিবেচিত **হবেন** এবং তাঁর মতামত গুঞ্জনের পাতায় **প্রকাশিত করা হবে**।

contactpandulipi@gmail.com

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান



দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

সিম্ফনি

অমিত কুমার সাহা

জটিল জীবনাবর্তে আমরা ভাঙ্গি রোজ।
নদী যেমন ভাঙ্গে তার পার;
নিঃশব্দে আলগা হয় বাঁধন,
মাটির ভেতরে ভেতরে অনেক আগে থেকেই!
আমরা শুধু প্রত্যক্ষ করি সশব্দ ভাঙ্গনের মুহূর্ত।
নিরন্তর ঘটনা প্রবাহের ধারে আমাদের বাস;
বলা ভালো আমাদের ছুঁয়ে থাকে,
একের পর এক ঘটনা পরম্পরা।
ক্লিন্ন করে তোলে আমাদের। ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে
অনুভূতির উত্তরাধিকারের পর্যায়ক্রম; তবুও
'সবুজ ঘাসের দেশ'এর খোঁজে সিম্ফনি
বজায় রাখে ম্রিয়মাণ হৃদয়ের অশ্রুত স্পন্দন;
'দারুচিনি দ্বীপের ভিতর'। ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।





বি.দ্র.: অক্টোবার সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ৭ অক্টোবার, ২০২০।

ধারাবাহিক উপন্যাস

চার ঋতু-অধ্যায়

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(২)

বাড়ির পরিবেশ এখন একবারে স্তব্ধ। কে বলবে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এই বাড়িতেই এতো শোরগোল চলছিল। একটা হট্টগোলের শব্দে যেসব প্রতিবেশীরা একে একে এসে জমায়েত হয়েছিল, তারা নিজের মতো বিচারের রায় দিয়ে ক্ষণিকের জন্য ক্ষান্ত হয়ে বাড়ি চলে গিয়েছে। বসার ঘরের মৃদু আলোয় ঘরের ছড়ানো আসবাবপত্র ছাড়া পিকুর মা-বাবার বিষণ্ণ মুখগুলো দেখা যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে পিকুর বোন পিউ খিদেতে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। পিকুর মা চোখ মুছে পিকুকে ও পিকুর বোনকে খেতে দিলেন। কাঁদো কাঁদো গলায় পিকুর মা পিকুর বাবাকে বলে উঠলেন, "তুমি কি এখন ট্রেনের টিকিট পাবে! সবে সবে ট্রেন চালু হয়েছে। আর কলকাতায় গিয়ে থাকার অসুবিধা হবে না ঠিকই, কিন্তু খাওয়া-পরার ব্যাবস্থা কি করে হবে? তুমি যদি বাড়ির দলিলটা ঠিক করে করে রাখতে তাহলে আর এই ঘর ছাড়া হতে হত না।"

"পিকুর মা এছাড়া তো কোনো উপায় নেই। চেষ্টা তো করতে হবে। অনেক দিন ধরেই যে ভিতরে ভিতরে আমাকে

নিয়ে একটা চক্রান্ত চলছিল, সেটার আঁচ পেয়েছি। তবে এভাবে আমাকে বিপর্যস্ত করবে তা আন্দাজ করতে পারিনি। হায়! মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায় লোভের সাগরে।" এই বলে পিকুর বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

পিকু ব্যাপারটা কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলো না, শুধু সে এইটুকু আন্দাজ করেছিল এখান থেকে তাদের চলে যেতে হবে। পিকু চুপিচুপি দাদাই মানে দাদুর ঘরে গিয়ে দেখে, দাদাই টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। পিকু দাদাইয়ের কাছ থেকে পুরো ঘটনাটা জানতে চায়।

দাদাই তাকে বলেন, "ও কিছু না দাদুভাই আমরা এবার আবার কলকাতা যাব, তবে পাকাপাকি ভাবে। ওখানে দেখবে তোমার বেশি ভালো লাগবে।"

"কিন্তু আমার তো এখানেই ভালো লাগে। আর স্কুলের বন্ধুদের সাথেও দেখা হবে না। না দাদাই আমরা এখানেই থাকবো।" আবদারের ও অনুনয়-বিনয় করতে থাকে পিকু...

"আচ্ছা বেশ এখানেই থাকবে, তবে এখন নয়, বড় হও তখন এসে থেকো। আর সবসময় মনে রাখবে কোন কিছুর বিনিময় নিজের সঠিক মত বা সিদ্ধান্ত কখনও পালটাবে না।" এই বলে পিকুর দাদাইয়ের চোখ ছলছলে হয়ে গেল।

পিকুর শিশুমন দাদুর কথাটা মেনে নিতে পারলো না। শুধু বারবার মনে হলো কটা খারাপ লোকের জন্য তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিগত এক বছরে তো তারা

কত অভাবে ছিল। করোনার জেরে সব বন্ধ ছিল। তবু এমন তো কখনো হয়নি। কেউ তো আগে কলকাতায় গিয়ে থাকার কথা বলতো না। ওই মাঝে মাঝে শুধু ঘুরতেই যাওয়া হত কলকাতার বাড়িতে। তাছাড়া ওই ঘিঞ্জি শহরে পিকুর মন বসে না। হঠাৎ করে তার বাবার পূজারী বন্ধুরা তার বাবার সাথে এইরকম দুর্ব্যবহারই বা করলো কেন! তা ভেবে কূলকিনারা পেল না সে।

রাতে শুয়ে শুয়ে তার মনে পড়ে যাচ্ছিল, প্রিয় মাঠ-ঘাট, নদী সবুজে ঘেরা তার আশেপাশের প্রিয় প্রকৃতির কথা, আর স্কুলের শিক্ষক ও বন্ধুদের কথা। এইসব ভাবতে ভাবতে তার একটা কথা মনে পড়ে যায়। সে আর চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। মনে পড়ে গেল খুশবুর কথা। খুশবু তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। পিকুর মনটা অজানা আশঙ্কায় টনটন করে ওঠে। তাহলে কি আর কখনও খুশবুর সাথে দেখা হবে না! পিকুকে ছাড়া তো খুশবু একেবারে আবার একা হয়ে যাবে। মনে পড়ে গেল ফেলা আসা দিনগুলোর কথা... ...ক্রমশ■

বড় মাষ্টমশাই

সরজিৎ মণ্ডল

প্রি-প্রাইমারি তো তখন ছিল না, তাই আমাকে, সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী ক্লাস ওয়ানে খেলার ছলে মা সরস্বতীর সাথে যোগ দিতে হয়েছিল। ক্লাস ওয়ানে যখন ছিলাম, স্কুল মানে কিছুই জানতাম না। স্কুলে তো তখন থাকতামই না। পরে যখন ধীরে ধীরে স্কুলে সময় দিতে লাগলাম, তখন আস্তে আস্তে স্কুলে আসার মজা পেতে লাগলাম। স্কুলের নিয়মশৃঙ্খলা এত বেশি ভালো লাগতে লাগল, যে স্কুল না গেলেই আমার খারাপ লাগত। ঠিক এইসময় সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বড় মাষ্টার মহাশয়ের সান্নিধ্যে এলাম। ওনাকে ছাত্রছাত্রীরা সবাই বড় মাষ্টমশাই আর গ্রামের লোকের অনেকেই বুড়ামাষ্টার বলত।

বড় মাষ্টমশাই বয়সে তখন প্রৌঢ়। তবে তখনও তাঁর স্বাস্থ্য ছিল খুবই ভালো আর গায়ের রং ছিল বেশ ফর্সা। তাঁকে দেখে স্কুলের সব মাষ্টমশাইরা ভয় পেতেন আর শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর জীবনটাই ছিল একটা আদর্শের উদাহরণ। তাঁর পোষাক বলতে মাত্র একটা ধুতি, গায়ে জামা নেই। ধুতির পরা অংশ বাদে বাকি কিছুটা গায়ে ফেলা থাকত।

ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতো। পরে জেনেছি, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকতেন তিনি, অবশ্য তাঁর কাজকর্মও তাই বলত।

শুনেছিলাম, এই বড় মাষ্টমশাই নাকি মাত্র ক্লাস সিক্স পাশ ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিয়মশৃঙ্খলা আদর্শ, জীবন ও যোগ্যতা ছিল অনেক অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো। বড় মাষ্টমশাইয়ের ঘর ছিল অনেক দূরে। তাই তিনি স্কুলেই থাকতেন সারা দিনরাত। স্কুলকেই তিনি ঘর হিসেবে মেনে নিয়ে চারদিকে অনেক গাছপালা লাগিয়ে ছিলেন, বাগান করেছিলেন। আর আমাদেরকেও বাগান করার জায়গা দিয়ে, গাছ লাগানো করাতেন।

আমরা ক্লাস ওয়ান, টু, থ্রী ও ফোর-এর সব ছেলেমেয়েরা ক্লাস অনুযায়ী চারটে বাগান করেছিলাম। সেখানে কত ফুল ও ফলের গাছ লাগানো হত। গাছের ফুল কেউ ছিঁড়ত না। গাছে খাবারের ফল হলে কেউ তুলত না। বড়মাষ্টমশাই যেদিন বলতেন সেদিন ফল তোলা হত আর কেটে কেটে সবাইকে একটু হলেও দেওয়া হত। গাছের যে প্রাণ আছে তা তখুনি আমরা বুঝে গেছিলাম। আর সেজন্য গাছের ফুল ও ফল তোলার আগে আমরা গাছকে পুজো করতাম। পরে বড় হয়ে জানতে পারি, আমাদের বিজ্ঞানী শ্রী জগদীশচন্দ্র বোসের অনবদ্য আবিষ্কার “গাছের প্রাণ আছে” তত্ত্বের কথা।

আদর্শ

একবার আমার বন্ধু ত্রিভঙ্গ, যে স্কুলে একদিন বলেছিল নাকের কাজ কফ বেরোনো, ভীষণ মার খেয়েছিল এই বড় মাষ্টমশাইয়ের হাতেই। ব্যাপারটা হয়েছিল কী, আমরা তখন তৃতীয় শ্রেণীতে, ত্রিভঙ্গ আমাদের ক্লাসেরই। একদিন বিকেলবেলায় ত্রিভঙ্গ স্কুলে এসে চুপিচুপি চতুর্থ শ্রেণীর বাগানে ঢুকে বেশ কিছু বাচ্চা গাঁদাফুলের গাছ ব্লেড দিয়ে কচকচ করে কেটে দিয়েছিল। ক্লাস ফোরের দীপক তা দেখে ফেলেছিল। সুতরাং, পরের দিন তা বড় মাষ্টমশাইকে বলে দিল। ব্যস, বড় মাষ্টমশাই ত্রিভঙ্গকে এমন পিটুনি দিয়েছিলেন যে, তারপর তিনদিন ত্রিভঙ্গ স্কুলেই আসেনি। সেদিনই জেনেছিলাম, বড় মাষ্টমশাইয়ের মার কাকে বলে। সেই ভয়ে আমি জ্ঞানত এই স্কুলে তারপর কোনদিন কোন অন্যায় করার সাহস পাইনি।

বড়মাষ্টমশাই, প্রতি ক্লাসের দেওয়ালে দেওয়ালে স্মরণীয় মহাপুরুষ ও স্মরণীয়া মহীয়সীদের ছবি আটকে রাখতেন। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুভাষচন্দ্র বোস, শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাময়ী দেবী ও জগদীশচন্দ্র বোসের ছবি দেওয়ালে টাঙানো থাকত। আমরা ওই ছবিগুলোকে তখন ঠাকুর ভেবে পুজোর মত ভক্তি করতাম। আর ছবিগুলোর মাঝে মাঝে উনাদের বাণী লেখা থাকত। তখনই আমি দেখেছিলাম, দেওয়ালে দেওয়ালে স্লেটের মতো শক্ত কাগজের পাটায় লেখা আছে, “চুরি করিও না। চুরি

করা পাপ।” “ঝগড়া করিতে নেই”, “মিথ্যা বলিও না”, “পিতামাতার অবাধ্য হইও না”, ইত্যাদি কত কত মহান অমূল্য বাণী ও হিতোপদেশ। এখন সব মনে নেই। তবে বলতে পারি, সেসব লেখা পড়ে আমি রাতারাতি পাল্টে গেছিলাম। এমনকি মা পর্যন্ত অবাক হয়ে যেত। মা যা বলছে তাই শুনছি, ঝগড়া করছি না। মিথ্যা বলছি না। দাদা বা বন্ধুরা, কাউকে বাজে কথা বা কুবাক্য বলল তো অমনি মাকে এসে তা বলে দিলাম। বাবাকে ভয় পেতাম, তাই বাবাকে সব কথা বলতাম না ।

আমাদের স্কুলে তখন এখনকার মতো হাতের কাজ বা শরীর চর্চাও করা হত। মাষ্টারমশাই বললেন, কাল তোমরা তালপাতা নিয়ে এস। পরেরদিন তা নিয়ে এলাম। শুরু হল তালপাতার চাটাই বোনা বা বাটির মতো পাত্র বা খেলনা তৈরি করা। কাদা দিয়ে আমরা মাটির পুতুল, খেলনা, এমনকি নানারকম সব্জি বা ফল; যেমন-বেগুন, ঝিঙে, ঢেঁড়স, আম, তাল ও কলা বানাতাম।

বিকেলবেলায় কাবাডি বা ফুটবল খেলা হত স্কুলের বাইরের চত্বরে ফুটবল আমার প্রিয় ছিল। আমি খুব খেলতাম। স্কুলে সব মহাপুরুষ আর মহীয়সীদের জন্মদিন পালিত হত। আমরা সেই দিন নানারকমভাবে অংশ নিতাম। যেমন, কেউ কবিতা আবৃত্তি করত, কেউ গান গাইত, কেউ বা কারা নাচত আবার কোন কোন দল নাটকও করত ।

আদর্শ

আমি একবার কবিতা বলতে বলতে মাঝখানে বলা থামিয়ে কপালে হাত ঠুকে দুম করে বসে পড়েছিলাম। সবাই খুব হেসেছিল। “রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পবন সীতা রাম” এই গানটি প্রায়ই দল বেঁধে গাওয়া হত আর সঙ্গে সঙ্গে একদল ছেলেমেয়ে গোল হয়ে নাচত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “অমল ও দইওয়ালা” বা সুকুমার রায়ের “অবাক জলপান” নাটক হত প্রায় প্রতি বছরই।

প্রত্যেকদিন সবাই তালে তালে গা দুলিয়ে দুলিয়ে সুর করে কবিতা পড়তাম। রোজ ক্লাসের শেষে সবাই একসাথে নামতা বলতাম। আমাদের প্রতিদিন শেষ কথাটা হত, সউচ্চে –‘দশে দশে শ’ আর অনুচ্চে ‘ঘরকে পালি চ।’

সবদিন স্কুলে এসে প্রথম ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে আমরা প্রতি শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা স্কুলের বাইরের উঠোনে এক একদল করে লাইনে দাঁড়াতাম। সবার সামনে প্রথম শ্রেণী, তার পিছনে দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় ও পরে চতুর্থ শ্রেণী। আমাদের সবার মুখ উত্তর দিকে আর সবার সামনে বড় মাষ্টমশাই আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। তারপর আমরা সবাই জোড়হাত করে একসাথে সউচ্চে প্রার্থনা করতাম, ‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা...’

প্রার্থনা শেষ হলে এক মিনিট নীরবতা পালন। তারপর স্কুলের কোন খবর আমাদেরকে জানানোর থাকলে বড়মাষ্টমশাই

তা বলে দিতেন। যেমন, কাল স্কুল ছুটি থাকবে, বা পরের সপ্তাহ থেকে পরীক্ষা হবে বা কাল কোন মহাপুরুষের জন্মদিন পালিত হবে আর কিভাবে তা হবে, ইত্যাদি। এমনকি খবর পড়াও হত এই প্রার্থনা শেষে খবর পড়া মানে কোন সেরকম খবর থাকলে মাষ্টারমশাই বা যে ছাত্র বা ছাত্রী তা বলতে চায়, সবার সামনে গিয়ে জোরে জোরে তা বলত।

বেশির ভাগই স্থানীয় খবর যেমন, কাল বৃষ্টি হয়েছিল বা ঝড় হয়েছিল, কাল আমাদের পাশের গ্রামে আগুন লেগেছিল বা কাল আমাদের বা পাশের গ্রাম ফুটবল খেলাতে জিতেছে বা কারোর জন্ম-মৃত্যুর খবর ইত্যাদি। একবার আমি এই খবর পড়াতে সবার আজবের বা হাসির খোরাক হয়েছিলাম। যেহেতু, অনেকে খবর বলে, আমারও ইচ্ছে হল একদিন খবর পড়ার। আমি গিয়ে বললাম, “ইন্দিরা গান্ধী কাল বিদেশ গেছেন।” আমার খবর শুনে সবাই প্রথমে চুপ। তারপর কেমন হাসির গুঞ্জন শুনেছিলাম।

আসলে ছাত্র-ছাত্রীরা যে সব খবর পড়ত তা কেবল ওই এলাকার খবর অর্থাৎ স্থানীয়। কেবল মাষ্টারমশাইরাই স্থানীয় ও বৃহৎ দেশের খবর বলতেন। মাষ্টারমশাইরা খবর বলার আগে উল্লেখ করতেন, ‘দেশের খবর’ কি ‘স্থানীয় খবর।’ আমি ভুলে খবরটা আমার কাকার পরামর্শে স্কুলে গিয়ে বলেছিলাম। পরে পুরো একদিন কাকার সাথে কথাই বলিনি।

আদর্শ

একবার দাদা আমায় বলল, "আজ স্কুল ছুটি, যাস না।"

আমি বললাম, 'কেন?'

— নজরুল ইসলাম মারা গেছেন কাল।

— তো?

— সেইজন্য ছুটি।

— সে তোমাদের স্কুল ছুটি থাকতে পারে, আমাদের কেন থাকবে?

দাদা, আমাকে আরও কিছু বলেছিল। তবুও স্কুলে আসা থেকে আমাকে বিরত করতে পারেনি সেদিন। অথচ, এই দাদাই একসময় আমাকে ধরে বেঁধে স্কুলে নিয়ে আসত। আসলে আমি স্কুলকে তখন এত ভালোবাসতাম যে স্কুল কামাই করতে চাইতাম না।

দাদার কথাকে অগ্রাহ্য করার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমি তখন দাদার খবরটাকে স্থানীয় খবর হিসেবে নিয়েছিলাম অর্থাৎ ভেবেছিলাম, নজরুল পাশের গ্রামের কেউ হবে, যে হয়তো দাদাদের স্কুলে পড়ত। তখন জানতাম না যে ইনি একজন আমাদের দেশের বরেণ্য কবি। আগের দিনে স্কুলে কীভাবে যে খবরটা মিশ করেছিলাম তা মনে নেই। সে যা হোক, স্কুলে তো চলে এলাম। এসে দেখি সে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা। যেখানে রোজ স্কুল চলাকালে ছেলেমেয়েরা সরগরম করে রাখে, সেই স্কুলই যেন মৃত হয়ে পড়ে আছে বা বিশ্রাম নিচ্ছে। চারদিক নীরব ও

নিস্তব্ধ। হঠাৎ, আমি বড় মাষ্টমশাইকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ভয় হল, ভূত দেখছি না তো? পরক্ষণেই মনে পড়ল, ওঃ, বড় মাষ্টমশাই তো স্কুলেই থাকেন। ভয় দূর হল।

উনি হাসতে হাসতে আমার দিকে এলেন। বললেন, “কী ব্যাপার, আজ তো ছুটি?”

আমি কিছু বলতে যাব, এমন সময় উনি আবার বললেন, ঠিক আছে, এসছ যখন আমার সাথে একটু গল্প করে যাও। উনার জন্য বরাদ্যের খাবারের কিছু অংশ আমায় খেতেও দিলেন। আমি একবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলাম। না-না, দেশের না; আমাদের স্কুলের ব্যাপারটা কেমন আশ্চর্যের লাগছে, তাই না? ঠিক আছে, খুলেই বলি। এই স্কুলের জন্য প্রতিবছর একজন প্রধানমন্ত্রী মাষ্টারমশাইরা নির্বাচন করতেন ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে।

সে বছর, আমি তখন ক্লাস ফোরে। পড়াশুনায় ভাল ছিলাম বলে বা রোজ স্কুলে আসতাম বলে হয়তো, উনারা আমাকেই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করলেন। তখন তো আর জানতাম না, প্রধানমন্ত্রী আসলে দেশের কর্ণধার। জানলে হয়তো নিজেকে সেভাবে দেখতাম আর মজা নিতাম আরও বেশি। আমাদের স্কুলের এই প্রধানমন্ত্রীর কাজ ছিল অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে মাষ্টারমশাইদের বিশেষ করে বড় মাষ্টমশাইকে অবগত করা ও তাঁর কথামতো তা আবার

বাকি মন্ত্রীদের গোচর করা, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হল একেবারে স্কুল ক্যাপ্টেন বা শিক্ষকদের সামনে ছাত্র প্রতিনিধি।

সব ক্লাসের জন্য একজন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, সাফাইমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী ইত্যাদি নির্বাচন করে দিতেন মাষ্টারমশাইরা। প্রতিদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সকালে নিজের ক্লাসের সবার পোশাক ও পরিচ্ছন্নতা লক্ষ রাখত। যেমন, প্রত্যেকের আঙুলের নখ আর মাথার চুল ঠিকমতো ছোট করে কাটা আছে কি না, ঠিকমতো চুলে চিরুনী দিয়েছে কি না আর ঠিক পরিচ্ছন্ন পোশাক পরেছে কি না, ইত্যাদি। সব সাফাইমন্ত্রী স্কুলে এসেই তার ক্লাসের দলবল নিয়ে বাইরের উঠোন পরিষ্কারের আদেশ করত আর আমরা প্রত্যেকে একটি একটি করে পড়ে থাকা গাছের পাতা, কাগজ বা কুটি-কাঁটা কুড়িয়ে কুড়িয়ে দূরে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দিয়ে আসতাম। সাফাইমন্ত্রী আরও একটি বড় কাজের দায়িত্ব নিত। তা হল প্রত্যেক ক্লাসের সাফাইমন্ত্রী সেই ক্লাসের ছেলে আর মেয়েদের প্রতি সপ্তাহের একটা লিস্ট তৈরি করত। সেই লিস্ট অনুযায়ী ছেলেমেয়েরা যে যার নিজের ক্লাসের মেঝেতে জল ও গোবর দিয়ে নাতা দিত, প্রতি সপ্তাহের মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার। কেননা, আমাদের স্কুলের মেঝে তো মাটির থাকত, তাই তা হতে যাতে ধুলো উঠতে না পারে তাই এভাবে নাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হত।

কৃষিমন্ত্রী বাগান দেখাশোনা করত আমাদের স্কুলে সব ছাত্র-ছাত্রীদের দুপুরের খাবার মাইলো বা গম-ঘাঁটা দেওয়া হত বিনামূল্যে। এই খাবারের পরিমাণ ও বিতরণ ব্যবস্থা

খাদ্যমন্ত্রী ঠিক করত। শিক্ষামন্ত্রী স্কুল শুরু হওয়ার আগে যে যার ক্লাসের মাষ্টারমশাইয়ের পড়ানোর টেবিলে চক, ডাস্টার ও উপস্থিতি নথিভুক্ত করার খাতা মোতায়েন করে রাখত। প্রত্যেকের হাতের লেখার খাতা সংগ্রহ করে মাষ্টারমশাইয়ের পড়ানোর টেবিলে ক্লাস শুরুর আগে রেখে দিত। যদি পড়ানোর সময় ম্যাপ বা মানচিত্রের দরকার হত তো এই শিক্ষামন্ত্রী তা নির্দিষ্ট জায়গা হতে বের করে মাষ্টারমশাইয়ের টেবিলে এনে দিত। আইনমন্ত্রী লক্ষ রাখত কেউ অন্যায় করছে কি না। যেমন, কারোর বই-খাতা কেউ নিয়ে নিল বা ছিঁড়ে দিল বা চুরি করল কিংবা কেউ অকারণে কারোর পিঠে দুমাদুম বসিয়ে দিল বা চিমটি কাটল, ইত্যাদি।

আমার সবচেয়ে বেশি মজা হত যখন স্কুলে সরস্বতী পুজো হত। সকাল থেকেই আমাদের উপবাস একটা সাড়া জাগানো ব্যাপার ছিল। এর ফাঁকে বলে ফেলি, প্রত্যেকবার আমি আগের দিন ভুলে পেঁয়াজ খেয়ে ফেলতাম আর প্রতিবার মা সেজন্য পুজোর দিন ভোরে সেই প্রচণ্ড শীতে রুটি খাওয়াতো আর স্নান করাত।

যাই হোক, স্কুলে এসে আমরা সকাল থেকেই ঘণ্টা বাজাতাম, ঢং-ঢং-ঢং... সে ঘণ্টা বাজানোর জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে সুযোগ পেতাম। তারপর, পুজো দেখতাম। পুজো শেষ হলে নানারকম ফলের প্রসাদ পাব বলে লোলুপ হয়ে অপেক্ষা করতাম।

আদর্শ

একবার বড় মাষ্টমশায়ের আদেশে আমরা দশ-বারো জন সহপাঠী পাশের গ্রামে দৌড়ে গেছিলাম। সেখানে কারোর বাড়িতে নাকি আগুন ধরে গেয়েছিল এবং সেই আগুন নেভানোর জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছিল। আমি জানি, এখনকার দিনে এ ধরণের কাজ কোন শিক্ষক ছাত্রদের দিয়ে করাতে ভয় পাবে। প্রধানতঃ ছাত্রদের মা-বাবার ভয়ে। কিন্তু বড় মাষ্টমশাই সকলের এতই প্রিয় ছিলেন যে তাঁকে কেউ কোনদিন এরূপ সামাজিক কাজ হতে বিরত করতে পারত না। বলে রাখি, আমাদের তৎপরতায় আর অন্যদের সহযোগিতায় সেদিন সেই ঘর হতে পুরো সংসারের সবাই প্রায় অক্ষত অবস্থায় সেই আগুনের গোলা হতে বের হতে পেরেছিল। আমরা সব বন্ধুরা বালতি বালতি জল পাশের পুকুর হতে বয়ে বয়ে বড় লোকেদের হাতে তুলে দিচ্ছিলাম আর তারা সেই জল সেই আগুনে ঢেলে ঢেলে তা নিভিয়ে দিচ্ছিল। তখন তো আর এখনকার দিনের মতো আগুনের দমকল বাহিনীর সহজলভ্যতা ছিল না... তখন তো সেই শহর থেকে দূরের এই গ্রামগুলি তেমন কোন ভাল রাস্তা দিয়ে যুক্তও ছিল না। সব রাস্তাই ছিল সরু আর জল-কাদা-পাথর বা গাছে ভরা।

আমাদের সেই স্কুল আর বড় মাষ্টমশাইয়ের সম্বন্ধে আর কতই-বা বলব? শেষ নেই তবে আর বেশি কিছু না বললেও একটা কথা আমার এখনো বলা হয়নি। তা হল, এত সব

করা না হয় মানা যায়, যদি সে স্কুলের এ্যাকাডেমিক রেজাল্টও ভালো হয়। আমাদের সেই স্কুলের এ্যাকাডেমিক রেজাল্ট মন্ত্রবৎ ভালো হত। প্রায় সবাই শতকরা ৬০-এর বেশি নম্বর পেত চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি পরীক্ষায় যা বাইরের স্কুলে হত ও বহিরাগতদের দ্বারা মূল্যায়িত হত। আর প্রতি বছরই কেউ না কেউ বৃত্তিও পেত ভালো রেজাল্টের জন্য। আর এ ব্যাপারে আর একটা কথা বলি, যেটা বলা হয়তো অনেকের কাছে আমার অহংকার প্রকাশ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সে উদ্দেশ্য না নিয়েই বলছি, যে, আমি, তরুণ ও আমার আরও চার পাঁচজন সহপাঠী সেই প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে যেদিন ডাবচা স্কুলে ভর্তি হলাম ক্লাস ফাইভে তার একবছর পরেই জানতে পারি আমি সেই নতুন স্কুলে ক্লাস ফাইভে দেড়শ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ফার্স্ট হয়েছি ও আমার পুরানো সহপাঠী তরুণ দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে।

এই স্কুল ও বড় মাষ্টমশাইয়ের আদর্শে আমি এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলাম, যে পিতামাতা আর দেশ ও জাতির প্রতি এক গভীর মমত্ববোধ এবং একনিষ্ঠ দায়িত্ব ও কর্তব্যের তাড়নায় প্রতিমুহূর্তে নিজেকে আদর্শ নাগরিক বানাতে ধাবিত হই। সেই স্কুল শিক্ষা ও শিক্ষকের আদর্শের সুদূর প্রসারী ফল শুধু আমিই না আরও অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী যে পেয়েছে তা বেশ ভালোভাবেই জানি এবং সংখ্যাটা হাতে গোনার বাইরেই বলা যায়।

আদর্শ

না, এবার আমার আর কিছু বলে প্রমাণ করার তেমন ইচ্ছে নেই, আর কতই-বা বলব। শুধু এটুকু বলি যে, যেদিন বড় মাষ্টমশাই স্কুল ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিন, আমরা কেন – গোটা গ্রামের সব লোকই খুব কেঁদেছিল আর আমিও বেশ ভালমতোই বুঝে গেছিলাম, কেন সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ‘শ্রী নরেন পাল’ মহাশয়কে ‘বড় মাষ্টমশাই’ বলা হত বা হয়?

গল্পের নামকরণ মিলে গেছে, কাহিনীও এক স্থিতিশীল অবস্থায় এসে পৌঁছে গেছে, অর্থাৎ, এখানেই আমার গল্প শেষ হতে পারত, কিন্তু হল না। কারণ, এখনো না-বলা অনেক কথার মধ্য থেকে একটা কথা বলা আমার বাকি রয়ে গেছে, সেটা বলা খুবই দরকার। কেননা, এটা আজও এখানে ওখানে হচ্ছে শুনি।

বড় মাষ্টমশাই স্কুলের চাকরি ছেড়ে গেছিলেন যখন, তখন আমরা ক্লাস ফোরে সবে উঠি। এই ফোরে পড়ার সময় আমাদের জানতে খুব ইচ্ছে হত, যে বড় মাষ্টমশাই এত ভালো, মাসের পর মাস বাড়ি না গিয়ে স্কুলেই পড়ে থাকতেন, সেই তিনি আজ স্কুল ছেড়ে কোথায় কীভাবে আছেন? তাই আমরা যেদিন সবাই খুব ভালো রেজাল্ট করে ফোর পাশ করলাম, সেদিন আমাদের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পরামর্শে আমরা কিছু টাকা যোগাড় করে বড় মাষ্টমশাইয়ের জন্য ভালো উপহার কিনে পাঠালাম।

আদর্শ

এক সপ্তাহ পরে আমরা একটা চিঠি পেলাম। তাতে বড় মাষ্টমশাই লিখেছেন, “আমার খুব ভালো লাগছে, তোমরা খুব ভালো রেজাল্ট করেছো বলে। আমি স্কুল ভুলে কিভাবে কষ্ট পাচ্ছি, আমিই জানি। এব্যাপারে আমি আর বেশি কিছু বলতে পারছি না।” পরে, পুনশ্চ করে লিখেছিলেন, “তোমাদের উপহার আমি মাথায় তুলে রাখতে চাই, তবে কি জান, এই সময় তোমরা যদি উপহারের বদলে আমাকে কিছু টাকা পাঠাতে তাহলে খুব ভালো হত।” চিঠি পড়ে আমরা সবাই খুব দুঃখ পেলাম, বড় মাষ্টমশাইয়ের হত দরিদ্র অবস্থার জন্য। অথচ, শুনেছিলাম, উনার দুই বড় ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। সুতরাং, আমাদের আরও জানতে ইচ্ছে হল। পরে যা জানলাম, তা সত্যিই খুবই দুঃখজনক। জানলাম, উনার ছেলেমেয়েরা কেউ বুড়ো বাবাকে খেতে দেয় না।

খবরটা আমাদের খুব ব্যাথা দিয়েছিল। কিছুদিন পর, আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় অমিয়বাবু একদিন নিজে চলে গেলেন আমাদের সংগ্রহের কিছু টাকা ওনার হাতে তুলে দিতে। কিন্তু উনি ফিরে এসে যা বললেন তা খুবই হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী। উনি বললেন, “আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। বড় মাষ্টমশাই আর এ জগতে নেই!” আমরা সবাই সে খবর শুনে কান্নায় আছড়ে পড়লাম।

এমনিতেই প্রাণের স্কুল ছেড়ে তাঁর অবস্থা জলের মাছ ডাঙায় হয়েছিল, তারপর দুঃস্থ অবস্থায় খাদ্যাভাব ও নিজের

ছেলেমেয়েদের বঞ্চনাতে তিনি এমনই আঘাত পেয়েছিলেন, যে মৃত্যু তাঁকে শান্তি দিতে অচিরেই তার কোলে নিয়ে নিল।

খবরটা শুনে সেদিনই ঠিক করেছিলাম, আমি বড় হবই আর বড় হয়ে বড় মাষ্টমশাইয়ের বড় কাহিনী অবশ্যই একদিন লিখে হলেও সবার সামনে তুলে ধরব। তবে আমারও অনেক দেরি হয়ে গেল। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯



http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/



http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/



http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/



http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/



http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/



http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/



http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

প্রকৃত শিক্ষা

পাখির ছানা

শামসুদ্দীন শিশির (বাংলাদেশ)

পাখির ছানা খুঁজে বের করা ছিল সৈকতের নেশা। সুযোগ পেলেই বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো। কখনো একা, কখনো বন্ধুদের নিয়ে দল বেঁধে, চোখ থাকতো গাছে গাছে। কোথাও গাছের নীচে ঝুলে থাকা ডুমুরগাছের জোড়া লাগানো পাতায় সাদা সুতোয় সুনিপুণ কারুকাজে বোনা টুনটুনির বাসায় হানা দিত সৈকত। মানুষের উপস্থিতি টের পেলেই মা টুনটুনি পাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে যায় দূরে। কিচিরমিচির শব্দে কান্না জুড়িয়ে দেয় টুনটুনির ছানারা। সেই কান্নার করুন সুর সৈকতের মনকে একটুও নাড়া দেয় না, বাসা ভেঙে নিয়ে সে ছানাগুলোকে নিয়ে আসত। একবারও মা পাখিদের কথা ভাবত না।

দোয়েল আর কাঠঠোকরা বাসা বাঁধে গাছের গর্তে। বেশির ভাগই কদম, ছাতিয়ানি বা শিমুল গাছের নরম কাঠে ঠোঁট দিয়ে অপরূপ সুন্দর বাসা তৈরি করে। দোয়েল গাছে গর্ত তৈরি করতে পারে না। কাঠঠোকরা শক্ত ঠোঁট দিয়ে নিজের মতো করে বাড়ি তৈরি করে। কোন এক সুযোগে দোয়েল ডিম দেয়, কাঠঠোকরার বাসায় ডিমে তা দেয়,

বাচ্চা ফুটে। পোকামাকড় এনে খাওয়ায় মা দোয়েল বাচ্চা বড় হয়। ডানা মেলে উড়ে যায় দূরে।

এদিকে সৈকত ফন্দি করে কীভাবে দোয়েলের ছানা ধরে আনা যাবে। কখনো দোয়েলের বাচ্চা আনতে পারে আবার কখনো সৈকতকে দেখে উড়ে চলে যায়। ঘুঘু, রামশালিক, চন্দন, বক বাসা বাঁধতো আম গাছে, বাঁশগাছে কখনো কখনো সুপারি গাছের খোলের আড়ালে, কোন জায়গাই সৈকতের চোখ এড়াতে পারে না। সারাদিন টইটই, পাখির বাসা খুঁজে পাখির ছানা আনাই তার মূল কাজ। এতে সৈকত পরম আনন্দ উপভোগ করত, শৈশব এভাবেই কাটে সৈকতের।

একদিন সৈকতের মা বললেন, "শোনো সৈকত, তুমি কেন মা পাখিদের কষ্ট দিয়ে পাখির ছানা নিয়ে আসো? মা পাখিদের খুব কষ্ট হয়। তোমাকে তোমার মায়ের কাছ থেকে কেউ নিয়ে গেলে কী করবে? খারাপ লাগবে না?" সৈকত ভাবলো, "তাইতো।" তার ভীষণ মন খারাপ হলো। সে মাকে কথা দিল আর কোনদিন পাখিরছানা ধরতে যাবে না। ■



Photo by Ekaterina Belinskaya from Pexels


PREVENTION OF COVID - 19
Photo by Anna Shvets from Pexels